বোধোদয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

দশম সংস্করণ।

কলিকাতা

৫৩ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তক

সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া কপিরাইট্ রেজিষ্ট্রী করা গেল।

আনন্দমঠ প্রেসে

শ্রীক্ষেত্রনাথ হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

৫৩ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইং ১৯০১।

বিজ্ঞাপন

—:০:—

বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্প-বয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে, সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

২০শে চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রুপ্সা গ্রামে যে রীডিং ক্লব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে; উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তর মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন; ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহ-প্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩৯।

ষণ্ণবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, "তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়।" শ্রীমন্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্ত্তমান সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট স্থলে, "এক ভাগ তামা" এই নির্দ্দেশটি ভুল। "এক ভাগ তামা" ইহার পরিবর্ত্তে, "চারি ভাগ তামা" এরূপ নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রঙ্গপ্রকরণে, "তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়," এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

২৫শে ভাদ্র। ১২৯৩ সাল।

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের যতই আলোচনা হইতেছে, অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, দিন দিন, ততই পূর্ব্বতন মতের খণ্ডন ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং, বহুকাল পূর্ব্বে, তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, ইদানীন্তন মতের সহিত সেই সেই বিষয়ে বৈষম্য লক্ষিত হইবে, বিচিত্র কি। বোধোদয়ে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্মত যে কয়েকটি বিষয় আছে, তাহার যে যে স্থানে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংস্করণে, সেই সেই স্থান, সংশোধিত হইল। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের পক্ষে অনাবশ্যক বোধে, কোনও কোনও অংশ এককালে পরিত্যক্ত, ও কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত, এবং, অবশ্যজ্ঞাতব্য নূতন নূতন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে পুস্তকের কলেবরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য, যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; তবে কত দুর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না; এক্ষণে বিদ্বৎসমাজে পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বোধোদয়ের নূতন সংস্করণে, যেখানে যে দোষ ছিল, এ বারে তাহা সংশোধিত হইল।

১৫ই পৌষ।
সন ১৩০২ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচী

—:•:—

বোধোদয়

পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ দ্বিবিধ; সজীব ও নির্জীব। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অর্থাৎ যাহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্যু আছে, উহারা সজীব পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেই খানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে নির্জীব বা জড় পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। সজীব পদার্থের মধ্যে যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে প্রাণী বলে; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

আর, যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে না, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

ঈশ্বর

ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা।

প্রাণী

প্রাণিগণের অপর এক নাম জন্তু। জন্তুগণ মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া, প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা

শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল প্রাণীর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না; কর্ণ আছে, কিছুই শুনিতে পায় না; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা জড় পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোক, নাক, কান, হাত, পা, সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে; দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে; কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে; আর কতকগুলি, স্থল ও জল, উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান। আর সমুদয় জীব মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব গর্দ্দভ, ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা; এজন্য, পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি পশুর পায়ে খুর আছে; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগল, মেষ প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত, অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও

পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির। বানরগণের দেহ লোমে আচ্ছাদিত বটে, কিন্তু উহারা চতুষ্পদ নহে। উহারা হস্ত ও পদ উভয়েরই অঙ্গুলি দ্বারা বৃক্ষের শাখা ধরিতে পারে; এজন্য, পণ্ডিতেরা উহাদিগকে, চতুষ্পদ না বলিয়া, চতুর্হস্ত বলিয়া থাকেন। বানর, বুদ্ধিতে মনুষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইলেও অন্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুই পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ করে না। পক্ষীর দুটি পা আছে; তাহা দ্বারা চলিতে পারে এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে। প্রায় সকল পক্ষী, খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া, অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কোনও কোনও পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। আমেরিকায় এক প্রকার পক্ষী আছে; উহা ভ্রমর অপেক্ষা বৃহৎ নহে। কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি কতকগুলি

পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। আফ্রিকাদেশে উট্-পক্ষী নামে এক প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়; উহা উচ্চে ছয় সাত হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে; উহারা জলচর পক্ষী। সন্তরণের সুবিধার জন্য, পরমেশ্বর জলচর পক্ষীর পায়ের অঙ্গুলি, এক খানি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা, পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পক্ষী সকল আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান বলে।

মৎস্য এক প্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ, চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। বুয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসিয়া বেড়ায়। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর এক প্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিকটিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, উহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টিপ্রহার করে।

পতঙ্গও এক প্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফড়িঙ, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি। পতঙ্গের ন্যায়, কীটেরা উড়িয়া বেড়াইতে পারে না।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু

আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণনামক যন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবসমূহে পরিবৃত। কিন্তু, সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্য্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে শ্বাপদ অথবা শিকারি জন্তু বলে।

গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং, মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। গ্রাম্য পশুরা অতি শান্তস্বভাব; মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায়, সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে; উহা-

দিগকে স্তন্যপায়ী কহে। কোনও কোনও প্রাণী, পক্ষীর ন্যায়, অণ্ড প্রসব করে; উহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মৎস্য, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ মাত্রই অণ্ডজ।

কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষ রূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্ত্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি বাদুড়কে পক্ষী বলে; কিন্তু বাদুড় পক্ষী নহে, স্তন্যপায়ী। পশুদিগের ন্যায় উহাদিগেরও চারি পা আছে। সম্মুখের দুই পায়ের অঙ্গুলি শরীরের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, এবং এক খানি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। উহাকেই আমরা বাদুড়ের ডানা বলি। সমুদ্রে এক প্রকার সুবৃহৎ মৎস্যাকৃতি জন্তু বাস করে, তাহার নাম তিমি। তিমি স্তন্যপায়ী; অতএব উহাকে মৎস্য বলা উচিত নহে। চিংড়িও এক প্রকার জলজ কীট, মৎস্য নহে।

লোকে সচরাচর গুটিপোকাকে কীট বলিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক গুটিপোকা কীট নহে; পতঙ্গ। অণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, উহারা কিছু

কাল কীটের অবস্থায় থাকে; পরে সহসা উহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে উহাদের পাখা উঠে এবং উহারা উড়িয়া বেড়াইতে শিখে। গুটিপোকার ন্যায় প্রজাপতিকেও ঐরূপ তিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে, কোন্ জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য, কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্য্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত, মনুষ্যেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ, অন্য অন্য পশু অপেক্ষা, কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।

মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য, সর্ব্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায়, চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের দুই হাত, দুই পা। দুই পা দিয়া, ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ, দুই হস্ত দ্বারা, আহারসামগ্রীর আহরণ করে, গৃহ-সামগ্রী ও পরিধান বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহনির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্রে, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি লোকালয়

ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকেই, গ্রামে ও নগরে, পরস্পরের নিকটে, বাটীনির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে; যেমন কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া, বাস করে। ইহার তাৎপর্য্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবে, ও পরস্পর দেখা শুনা ও কথাবার্ত্তায় সুখে কালযাপন হইবে। যাহারা এই রূপে একত্র বাস করে, তাহাদিগকে অন্যোন্যের প্রতিবেশী বলা যায়। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা সদ্ভাব থাকা উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে, অসুখের বৃদ্ধি হয়। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা, তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস; এ নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ, উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল; ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ।

প্রাণী সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারি জন্তু দিবাভাগে নিদ্রা যায় এবং রাত্রিকালে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

আমরা নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্য্যকারক নহে। প্রাণী সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে; যখন, নিদ্রা

না যাইয়া, জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল প্রাণীই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জীয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক করা হইলে, এই সমুদয় বস্তু সুস্বাদ ও পুষ্টিকর হয়; কাঁচা খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়।

প্রাণিগণ যখন, সচ্ছন্দ শরীরে, আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়; আর, যখন তাহাদের পীড়া হয়, স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। সময়ে সময়ে, অসাবধানতা প্রযুক্ত, মনুষ্যের পীড়া হইয়া থাকে। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন; সকলেরই, ঐ ব্যবস্থানুসারে, চলা

উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগ-মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় এক শত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্য্যের আলোকে অল্প কাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদয় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাটি বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশি, নব্বই, অথবা এক শত বৎসর বাঁচে, তাহা-দিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু, অনেকেই শৈশব কালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত

শিশু আছে, তাহারাও, তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু, চিরজীবী হইবে না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবে।

জন্তু সকল মরিলে, তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্ব্বের মত, দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে, কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং অল্প কালের মধ্যেই গলিত ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে; এজন্য, কেহ মরিলে, লোকে অবিলম্বে তাহার দেহ দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে, ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন্ হাত ডান্, কোন্ হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর যাহারা, বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

ইতর জন্তু

মনুষ্য ভিন্ন অপর সকল প্রাণীকে ইতর জন্তু কহে। ইতর জন্তুর মধ্যে কোনও কোনও জাতি তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে ; উহাদিগকে তৃণজীবী বলে ; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, হরিণ, ছাগল ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও জাতি, অপর জীবের প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায় ; উহারা শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তু ; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কোনও কোনও জন্তু, মনুষ্যের ন্যায়, উদ্ভিদ ও মাংস দুইই আহার করে। ভল্লুকেরা, সচরাচর

ফল, মূল ইত্যাদি ভক্ষণ করে; কিন্তু, এ সকল খাদ্যের অভাব হইলে, মাংসাহার দ্বারাও উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে।

তৃণজীবী জন্তুরা মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে। গরুর মত, মনুষ্যের উপকারী জীব, পৃথিবীতে আর নাই। দুগ্ধে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, এবং ক্ষীর, দধি, ছানা, নবনীত প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়; চর্ম্মে পাদুকা নির্ম্মিত হয়; শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া চিরুণি প্রস্তুত করে; অস্থিতে ছুরির বাঁট গড়ে; এবং গোময় হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ, শকটচালন প্রভৃতি কর্ম্মেও গরুকে নিযুক্ত করা যায়। অতএব সকল মনুষ্যেরই, গরুকে যত্ন ও আদর করা কর্ত্তব্য। গরুর ন্যায়, মহিষও আমাদের অনেক কাজে লাগে। মহিষের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা ঘি বলে।

মেষ ও ছাগ হইতে আমরা কতিপয় নিতান্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রাপ্ত হই। তিব্বৎ দেশের ছাগলের লোমে শাল হয়। আমেরিকায় আল্‌-পাকা নামে এক প্রকার জন্তু আছে। তিব্বৎ

দেশের ছাগলের ন্যায়, উহারও লোম সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ। এই লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকেও আল্‌পাকা বলে।

অশ্ব যেমন বলিষ্ঠ ও বেগবান্‌, তেমনই সাহসী ও শান্তস্বভাব। অশ্বে অরোহণ করিয়া অনায়াসেই, সুদূর পথ অতি সত্বরে যাওয়া যায়। লোকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া, বিনা ক্লেশে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। কোনও কোনও দেশে, অশ্ব দ্বারা কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

হরিণজাতি দেখিতে অতি সুশ্রী। উহারা যখন শিং উঠাইয়া, একবারে চারি পা তুলিয়া, লম্ফ দিতে দিতে, বেগে গমন করে, তখন উহাদিগকে অতিশয় সুন্দর দেখায়। তিব্বৎ ও নেপালে কস্তুরিকা মৃগ নামে একজাতি হরিণ বাস করে। উহাদের নাভিদেশে এক প্রকার সুগন্ধ পদার্থ জন্মে; তাহাকেই আমরা সচরাচর কস্তুরী বা মৃগনাভি বলিয়া থাকি। মৃগীদের নাভিদেশে কস্তুরী থাকে না।

হিমালয় প্রদেশে চমরী নামে এক প্রকার জন্তু আছে; উহার লাঙ্গলের লোমে চামর প্রস্তুত হয়।

সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে, একজাতি বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে। তাহাদের মধ্যে, বালুকণার ন্যায় কোনও ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট হইলে, তৎপ্রদেশ হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। ঐ রস জমিয়া শুভ্র, মসৃণ, উজ্জ্বল, ও গোলাকৃতি এক প্রকার কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থের নাম মুক্তা। সিংহলদ্বীপের উপকূল ও পারস্য উপসাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

কীট ও পতঙ্গ হইতেও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ। অশ্বত্থ, ডুমুর, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বল্কলে এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কীটের অঙ্গ হইতে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম লাক্ষা।

তুত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটিপোকা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। পোকা হইতে পতঙ্গের অবস্থায় আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, উহাদের মুখ হইতে, সূক্ষ্ম সূত্রের মত, লালা নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং বায়ুর সংযোগে অবিলম্বেই দৃঢ় হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সূত্রের নাম রেশম। লালা

নিঃসরণ করিবার সময় পোকা অনবরত ফিরিতে ঘুরিতে থাকে, এবং ক্রমে রেশম নির্ম্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া কহে। কোয়া উষ্ণ জলে ফেলিয়া, বা অন্য কোনও উপায়ে, পোকাকে বিনষ্ট না করিলে, উহা কিছু দিনের মধ্যেই আবরণ কাটিয়া পলায়ন করে। ভারতবর্ষ, জাপান, চীন, ইটালি প্রভৃতি দেশে, নিয়ম মত, গুটিপোকার চাস হইয়া থাকে। চাসীরা, এই পোকাকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, এবং অণ্ড হইতে কীট জন্মিলে, তাহাদিগকে নরম তুতের পাতা, ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, খাইতে দেয়। তসর, গরদ, চেলী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র রেশমে প্রস্তুত হয়।

মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়। উহারা যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহার নাম মধুচক্র; মধুচক্রের চলিত নাম মৌচাক। মৌমাছিরা মৌচাকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র খোপ প্রস্তুত করে, এবং প্রত্যেক খোপে এক একটি ডিম্ব প্রসব করে। বর্ষাকালে প্রায়ই কোনও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না, হইলেও বৃষ্টির জলে তাহার মধু ধুইয়া

যায়। এজন্য, বসন্তকালে যখন নানাবিধ ফুল ফুটে, তখন মৌমাছিরা, ঐ সকল ফুল হইতে যত্নে মধু আহরণ করিয়া, মধুচক্রে আনিয়া রাখে। চাক ভাঙ্গিলেই সেই মধু সংগ্রহ করা যায়। সমুদায় চাক ভাঙ্গিলে, মধুমক্ষিকারা একবারে উপায়বিহীন হয়; এজন্য, তাহার কিয়দংশ রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মৌচাক গলাইলে, মোম প্রস্তুত হয়। মোমের বাতি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। আমরা সচরাচর যে বাতি জ্বালিয়া থাকি, তাহা চর্ব্বির, মোমের নহে।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে

জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন ; ত্বক্ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু।

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন্ বস্তুর কেমন আকার, কোন্ বস্তু সাদা, কোন্ বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায় ; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোক থাকে, এজন্য, অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারাও, অতি অল্প আলোক হয় ; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রদীপ জ্বালিলে, বিলক্ষণ আলোক হয় ; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে ; এজন্য, চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা

হইলে, আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতে চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম। পক্ষ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত, ক্লেশ পাইতে হয় না। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দ্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ তারা ভেদ করিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন, ঐ কোমল পাতলা পর্দ্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র

প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়, তাহাতেই আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণ।

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়; এ নিমিত্ত, কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত, যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণ-জ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে; কেহ কিছু বলিলে, অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকা।

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকার দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ, কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু

দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ বা সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

জিহ্বা।

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়; এজন্য, জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ-গ্রহ হয়।

বস্তুর আস্বাদন নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেঁতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত, এবং মরিচ কটু লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ

নাই; মুখে দিলে না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

ত্বক্।

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক্ সকল শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য, শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্য অন্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া, প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথস্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়-বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ,

হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অতএব ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায়, পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু, তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা, অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। এরূপ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে; অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল; পলায়িত পশুর কেবল গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। যে সকল জন্তু, আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া, দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে, তাহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্ত্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু,

যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছু মাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ, যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ শক্তি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

বাক্যকথন—ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা নানাবিধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। এইরূপ শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং ঐ উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তির দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।

পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুদিগের বাক্‌শক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও, কোনও ভাবের উদয় হয় বটে; কিন্তু উহারা, মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে।

গো, মহিষ, মেষ, ছাগল, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ, বুঝিতে পারা যায় না; এজন্য, ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না। শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা, মনুষ্যের মত, স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে; কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারে না; যাহা শিখে, বারংবার তাহাই উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাক্‌শক্তির অভাবে, পশু, পক্ষী, ও আর আর জন্তুদিগকে, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা, ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং, তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল,

এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবে।

আমাদের বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না; উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশব কালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা, সজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত, প্রথমশিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্ট কথা কহিতে চেষ্টা করা উচিত; তাহা হইলে, সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর, যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না; সকলেই ঘৃণা করে। কি

বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক্ পৃথক্। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোক যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে উর্দ্দু বলে। উর্দ্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন, উহা সর্ব্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা ইংরেজী।

ইংরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা; এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহপূর্ব্বক ইংরেজী শিখে। কিন্তু, অগ্রে

মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু, ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

উদ্ভিদ

যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অথচ জন্তুর ন্যায়, গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহাদের নাম উদ্ভিদ; যেমন বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি। উহারা সচরাচর ভূমি ভেদ করিয়া উঠে; এজন্য, উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায়; আর, যখন শুকাইয়া যায়, তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উহারা, যেখানে জন্মে, সেই খানে থাকে; এ নিমিত্ত, উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা, ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রসই উদ্ভিদের খাদ্য। রস মূল হইতে স্কন্ধদেশে উঠে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে, সমস্ত শাখা, প্রশাখা, ও পত্রে প্রবেশ করে। এই রূপে, ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়; তাহাতেই উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া, বৃক্ষের উপর জন্মে; এবং ঐ বৃক্ষ হইতে রস গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। এরূপ উদ্ভিদের নাম বৃক্ষরুহ বা পরগাছা। শীতকালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়; এজন্য, পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে সহজে আঘাত লাগে না, এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে, উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে, উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ, ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, বীজ প্রভৃতি আমাদের আহার; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি; তূল হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া লই; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকাদেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বল্কল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে, তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলা ক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি

হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল গৃহের অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও, আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বট-বৃক্ষ ছিল; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোঁড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু

পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বল্কল এরূপ স্থূল, কোমল, ও রন্ধ্রশূন্য যে, তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্ম্মিত হয়। আমেরিকার পেরুপ্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন্ উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জ্জিলিঙ্ অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাস হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন্, কেম্ব্রিক্ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রা-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন, আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে, প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা, এক প্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে ফেলিয়া রাখিলে, প্রস্তুত হয়। চীন,জাপান,আসাম, দার্জিলিঙ্ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে ঐ গুল্মের চাস হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাস হয়। উহার গাছ জলে পচাইলে, এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই নীল-বড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্‌সিল্ বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা বট গাছের ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধুনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গু, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্যাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগু-দানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কৃষিকর্ম্ম

আমরা প্রতিদিন যাহা খাই, তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন। লোকে, নিয়মিত কালে, লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া, বীজ বপন করে। গাছ জন্মিলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, এবং যাহাতে উহা উত্তম রূপে বাড়িতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেয়। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনে ও ফল পৃথক্ করিয়া লয়। এইরূপ ভূমি-খনন, বীজবপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম্ম বা চাস বলে। যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে, তাহাদিগের নাম কৃষক বা চাসী।

কৃষি দ্বারা ধান্য, গম, কলায় প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে, ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা, আর ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে; তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটোল, আলু, মূলা, লাউ,

কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কৃষিকর্ম্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাসের বীজ পৃথক্ করিলে, তূল হয়; তূল হইতে সূত্র হয়; সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, আমরা সেই বস্ত্র পরি। অতএব আমাদের পরিধানবস্ত্রও, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

ফল পাকিলে যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও জীবনহীন হয়, উহাদিগকে ওষধি কহে; যেমন ধান্য, কলায়, লাউ, কুমড়া, কদলী ইত্যাদি; বাঁশও ফুল ফল হইলে, মরিয়া যায়। এজন্য, লোকে বাঁশের ফুল হওয়া দোষ মনে করে।

ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু, বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য্য। পূর্ব্ব কালে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাস করিতে লজ্জিত হইতেন না। বহুকাল পূর্ব্বে, রোমদেশে, সিন্‌সিনেটাস্ নামে এক অসাধারণ বীরপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার সময়ে, রোমরাজ্য এক বার প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল যে, সিন্‌সিনেটাস্‌কেই

সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে হইবে। দূতেরা যখন তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া যায়, তখন তিনি স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন।

আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাস করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, লোকে ধনবান্ হইতে পারে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগে, এক ব্যক্তি, কয়েক বিঘা ভূমিতে, কেবল নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। যশোহর জিলার এক স্থান বহুকাল পতিত অবস্থায় ছিল। সেখানে, কেবল দুই একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ ভিন্ন, অপর কোনও বৃক্ষ সতেজে জন্মিত না। ইহা দেখিয়া এক সাহেব, ঐ ভূমি খর্জ্জুর বৃক্ষের উপযোগী বুঝিতে পারিয়া, উহাতে বহুসংখ্যক খর্জ্জুর বৃক্ষ রোপণ করেন; এবং, অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে গমন করেন।

কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, উদ্ভিদদিগের পুষ্টি-সাধনের জন্য কি কি উপায়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরাও বায়ু, আলোক, উত্তাপ, জল, ও উপযুক্ত

খাদ্য ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না ; অতএব, যাহাতে এ সমুদয়ের মধ্যে কোনওটির কিছু মাত্র অভাব না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জন্তু সকল যেরূপ নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পাইলে, যেমন আমাদের রোগ হয়, তেমনই উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য, বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না। ঘন করিয়া রোপণ করার আরও দোষ আছে। যে ভূমিখণ্ডে দুইটি মাত্র বৃক্ষের উপযুক্ত খাদ্য থাকে, তাহাতে চারিটা বৃক্ষ রোপণ করিলে, কাহারও প্রচুর আহার হয় না। অতএব, তাহারা সকলেই, হয় মরিয়া যায়, নয় অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, মনুষ্যের যে পরিমাণে আবশ্যক, উদ্ভিদের তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। লাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে, পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া, সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের অভাব হয়। এজন্য, সে দেশে প্রায় কোনও বৃক্ষই জন্মে না ; যে দুই এক প্রকার গুল্মাদি দেখা যায়,

তাহারা, বসন্তের প্রারম্ভে জন্মিয়া, গ্রীষ্মের শেষেই মরিয়া যায়।

বৃক্ষের মূলদেশের ভূমিখনন করিয়া, তাহাতে জলসেচন করিলে, মৃত্তিকা সরস হয়। মৃত্তিকা সরস হইলে, বৃক্ষগণ অনায়াসেই রস আকর্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি, বর্ষাকালের পরেই বপন করে। তখন ভূমি সরস থাকে, সুতরাং জলসেচনের আর প্রয়োজন হয় না।

যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্ব্বরা ভূমি বলে। সকল শস্যের খাদ্য ঠিক একরূপ নহে; কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট আছে, ইহা বুঝিয়া চাস করিতে পারিলে, অধিক ফললাভ হয়। এক ভূমিতে বারংবার একই শস্যের চাস করিলে, ক্রমে ঐ শস্যের যে খাদ্য তাহা ফুরাইয়া যায়। তখন আর সে ভূমিতে ঐ শস্যের চাস না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাস করা বিধেয়। এজন্য, বিচক্ষণ কৃষকেরা, এক ভূমিতে, প্রতিবৎসর নূতন নূতন শস্যের চাস করিয়া থাকে।

ভূমির উর্ব্বরতার হ্রাস হইয়া আসিলে, অথবা, কোনও ভূমিকে শস্য বিশেষের উপযোগী করিতে হইলে, তাহাতে সার দিতে হয়। পচা গোবর, পচা পাতা, খইল, চূণ ইত্যাদি ভূমির উত্তম সার। বিলাতের ভূমি, বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা, কোনও ক্রমে উর্ব্বরা নহে; অথচ, সার দিবার পারিপাট্যে, অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে সার দিবার তত প্রয়োজন হয় না। বর্ষাকালে, মৃত্তিকাদি বহন করিয়া, নানা দিক্ হইতে, ঐ সকল ক্ষেত্রে জল আসিয়া পড়ে। এই জল কিছু কাল স্থিত হইলেই, মৃত্তিকাদি নীচে পড়িয়া যায়; উহাকেই পলি বলে। নদীতে বন্যা হইলে, নিকটবর্ত্তী নিম্নভূমিতে এইরূপ পলি পড়ে এবং ভূমির উর্ব্বরতা বাড়াইয়া দেয়।

কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন সূর্য্যের উদয় হয়, আমরা শয্যা হইতে উঠি, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে

সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে; আর, সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে, প্রায় সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম্ম করে। রাত্রিকালে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে একদিবস হয়; অর্থাৎ, এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা বা ঘণ্টা; তিন ঘণ্টাতে, অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে, এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাকে শুক্লপক্ষ বলে। আর, যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে, এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু;

সেই ছয় ঋতু এই ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু ; আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই দুই মাস বর্ষা ঋতু ; ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস শরৎ ঋতু ; কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু ; পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস শীত ঋতু ; ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে, অর্থাৎ বার মাসে, এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ, বৎসরে তিন শত পাঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাটি দিনে বৎসর হইত। পূর্ব্ব কালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের

প্রথম দিবসে,নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়। চিরকালই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরব্ধ হইয়া থাকে। এই রূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত; সংবৎ, শকাব্দাঃ, ও সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর, শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আক্‌বর, হিজিরা নামের পরিবর্ত্তে, ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই

বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে, বিষয়কর্ম্মে, সকল শাক অপেক্ষা, সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্দশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ, ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মন্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা, যিশুখৃষ্টের জন্ম অবধি, এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খৃষ্টীয় শাক বলে। খৃষ্টীয় শাকের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

গণন—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর, সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে, অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি, এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া, উহাদের স্থলে ১, ২

প্রভৃতি অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি যেমন সংখ্যার বাচক হয়, সেইরূপ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যার পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই পূরণের বোধ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দ। যদি দুই রেখা ।। লিখা যায়, তবে শেষেরটিকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই সংখ্যার পূরণ, বলিতে হইবে, আর আগেরটিকে প্রথম ; কারণ, শেষের রেখাটি না লিখিলে, দুই সংখ্যা পূর্ণ হয় না ; আর, আগের রেখাটি না থাকিলে, এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ, তিন রেখা ।।। লিখিলে, শেষেরটিকে তৃতীয় অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরণ, বলিতে হইবে ; কারণ, শেষের রেখাটি না থাকিলে, তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। চারি রেখা ।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে চতুর্থ রেখা, পাঁচ রেখা ।।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে পঞ্চম রেখা বলা যায় ; কারণ, শেষের

ঐ দুই রেখা না থাকিলে, চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে, অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না; যেমন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি। এইরূপ, অঙ্কের শেষে ম প্রভৃতি অক্ষর যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবে। ঐ ঐ অক্ষরের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি; কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ; ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যদি কেহ এরূপ লিখে, "আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে, এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম," তাহা হইলে, তিন দিবসে, অথবা তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবে না; কেহ এরূপ বুঝিবে, ঐ কর্ম্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল; কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু, ৩

এই অঙ্কের পর যদি য় এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবে।

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা।

প্রথম	নবম	সপ্তদশ	পঞ্চবিংশ
১ম	৯ম	১৭শ	২৫শ
দ্বিতীয়	দশম	অষ্টাদশ	ষড়্‌বিংশ
২য়	১০ম	১৮শ	২৬শ
তৃতীয়	একাদশ	ঊনবিংশ	সপ্তবিংশ
৩য়	১১শ	১৯শ	২৭শ
চতুর্থ	দ্বাদশ	বিংশ	অষ্টাবিংশ
৪র্থ	১২শ	২০শ	২৮শ
পঞ্চম	ত্রয়োদশ	একবিংশ	ঊনত্রিংশ
৫ম	১৩শ	২১শ	২৯শ
ষষ্ঠ	চতুর্দশ	দ্বাবিংশ	ত্রিংশ
৬ষ্ঠ	১৪শ	২২শ	৩০শ
সপ্তম	পঞ্চদশ	ত্রয়োবিংশ	একত্রিংশ
৭ম	১৫শ	২৩শ	৩১শ
অষ্টম	ষোড়শ	চতুর্বিংশ	দ্বাত্রিংশ
৮ম	১৬শ	২৪শ	৩২শ

ইত্যাদি।

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কের পর পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,

পহিলা ১লা	নয়ই ৯ই	সতরই ১৭ই	পঁচিশে ২৫শে
দোসরা ২রা	দশই ১০ই	আঠারই ১৮ই	ছাব্বিশে ২৬শে
তেসরা ৩রা	এগারই ১১ই	ঊনিশে ১৯শে	সাতাশে ২৭শে
চৌঠা ৪ঠা	বারই ১২ই	বিশে ২০শে	আটাশে ২৮শে
পাঁচই ৫ই	তেরই ১৩ই	একুশে ২১শে	ঊনত্রিশে ২৯শে
ছয়ই ৬ই	চৌদ্দই ১৪ই	বাইশে ২২শে	ত্রিশে ৩০শে
সাতই ৭ই	পনরই ১৫ই	তেইশে ২৩শে	একত্রিশে ৩১শে
আটই ৮ই	ষোলই ১৬ই	চব্বিশে ২৪শে	বত্রিশে ৩২শে

বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে, নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্ব্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তিই জন্মে। এজন্য, জগতের যাবতীয় পদার্থ, এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম, ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য, জগতে, অন্য অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে, হরিত, পাটল, ধূমল, এই তিনটি প্রধান। তদ্ভিন্ন, কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও ঐ তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ, সচরাচর বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণ নহে। অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে, সেই বস্তুতে সর্ব্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবে। শুক্ল বর্ণে সকল প্রকার মূল বর্ণই বিদ্যমান থাকে। মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের রশ্মি শ্বেতবর্ণ। এই রশ্মি, ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোনও কাচ-খণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর, আর শুক্লবর্ণ থাকে না। তখন এই রশ্মিকে শুভ্র বস্ত্রের উপর ধরিলে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, ও ভায়োলেট্, এই সাতটি বর্ণ পরে পরে, দেখিতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও, গগনমণ্ডলে, ধনুকের মত, নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু বলে। ঝাড়ের কলমের মত, বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, ঐরূপ লোহিত, পাটল, পীত প্রভৃতি সাত বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়,কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড়; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড়; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ, বলে। পুস্তকের উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হাত।

সকলের হাত সমান নহে; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্য-ভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্য ভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে। এরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে, অর্থাৎ ৮০০০ হাতে, ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যে রূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেই রূপে মাপা যায়; আমরা দেওয়াল, খুঁটি, কপাট, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যে রূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা, অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা, বৃহৎ

পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা, এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

১ টাকার যত ভার, তাহা	১ তোলা ;
৫ তোলায়	১ ছটাক ;
৪ ছটাকে	১ পোয়া ;
৪ পোয়ায়	১ সের ;
৪০ সেরে	১ মণ।

ধাতু

আমরা সর্ব্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, ঘড়া, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্ম্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে, সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া অতি পাতলা পাত ও সরু তার প্রস্তুত

করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়; আর, যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ।

গলাইলে, স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না, ও বর্ণের ব্যত্যয় হয় না; এজন্য, স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী। সর্ষপপ্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না; এজন্য, লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য, সচরাচর, উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা বা রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা বা রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কালিফর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও য়ুরাল পর্ব্বতেই অধিক।

রৌপ্য।

রৌপ্য জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাত

ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি নির্ম্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘটী বাটী প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পারদ।

পারদ রৌপ্যের ন্যায় শুক্ল ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ গুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে; জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্ব্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু, মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন, অন্য অন্য ধাতুর ন্যায়, ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; এবং, ঘা মারিলে, ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ, স্বভাবতঃ, সমস্ত তরল

দ্রব্য অপেক্ষা, শীতল বোধ হয়; কিন্তু, অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে, অনায়াসেই, অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

সীস।

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা, নরম; জল অপেক্ষা এগার গুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে; অত্যন্ত অধিক উত্তাপ দিলে, উড়িয়া যায়। জলে বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ভাবপরিবর্ত্ত হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স, ও আমেরিকা, এই সকল দেশে অপর্য্যাপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতে ও তিব্বৎ দেশেও, সীসের আকর আছে।

সীসে গোলা গুলি নির্ম্মিত হয়। কিছু শক্ত ও

উত্তম রূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাঞ্জন ও রঙ্গ মিশ্রিত করিলে, সীসে ছাপিবার অক্ষর নির্ম্মিত হয়।

সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসরবর্ণ রেখা পড়ে। লোকের সংস্কার আছে, সীসে পেন্সিল প্রস্তুত হয়; বাস্তবিক তাহা নহে, উহা গ্রাফাইট্ বা কৃষ্ণসীস নামে একরূপ অঙ্গারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণসীস আমেরিকা, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে, আকরে পাওয়া যায়।

তাম্র।

এই ধাতু জল অপেক্ষা আট গুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক গম্ভীরশব্দজনক; লোহ অপেক্ষা, অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

সুইডেন, সাক্সনি, গ্রেট্‌ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু,

মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক কার্য্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়। কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ জল অপেক্ষা সাত আট গুণ ভারী। লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা, সকল প্রধান ধাতু অপেক্ষা, অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না।

এক সের লৌহের সহিত ন্যূনাধিক এক তোলা অঙ্গার মিশ্রিত করিলে, ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইস্পাতকে উত্তাপ দ্বারা লোহিতবর্ণ করিয়া শীতল জলে ডুবাইলে, উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

ছুরি, কাঁচি, তরবারি প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ইস্পাতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রুশিয়া, এই কয় দেশে কিছু অধিক।

রঙ্গ।

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ, শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল; জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; রূপা অপেক্ষা নরম; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্কদ্বীপ, এই কয় স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে।

রঙ্গের ইংরেজী নাম টিন। লৌহের পাতে রঙ্গের কলাই করিলে, উহা দেখিতে সুন্দর হয়; এবং শীঘ্র, মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয় না। এই পাতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। উহাদিগকেই আমরা সচরাচর টিনের বাক্স, টিনের পেটারা ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত

করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসায় ঘটী, বাটী, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

পারা ও রাঙ মিশ্রিত হইয়া কাচের পশ্চাদ্ভাগে লাগিয়া থাকিলে, ঐ কাচে উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে। ঐ রূপ কাচকে দর্পণ বলে। লোকে দর্পণে মুখ দেখে। কখনও কখনও, পারদ ও রঙ্গের পরিবর্ত্তে, রৌপ্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দস্তা।

দস্তা, রাঙ অপেক্ষা কোমল এবং সীস অপেক্ষা কঠিন। এই ধাতু জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; পূর্ব্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু; দেখিতে উজ্জ্বল ও নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। দস্তা, সীসের ন্যায় জলে নষ্ট হয় না, অথচ সীস অপেক্ষা লঘু। এজন্য, ছাদের নল প্রভৃতি দস্তাতে গঠিত হয়। লৌহের পাতে দস্তার কলাই করিয়া, লোকে বাল্‌তি, গৃহের ছাদ ইত্যাদি নির্ম্মিত করিয়া থাকে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয়। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না। কলসী, গাড়ু, পিলসুজ প্রভৃতি বস্তু পিতলে প্রস্তুত হয়।

ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর, যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না থাকিত, তাহা হইলে, নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে, যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য, সকল সময়ে, সমান থাকে না; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন সে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ বা অক্রেয় বলে। আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ বা সস্তা বলে।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই সকল

ধাতু দুষ্প্রাপ্য; এ নিমিত্ত, ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা ভিন্ন, আর কোনও ব্যক্তির, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, তত পরিষ্কৃত হইত না। কোন্ রাজার অধিকারে, কোন্ বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে, এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর, ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্ম্মিত ; টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি রৌপ্যনির্ম্মিত। আর, ঐরূপ টাকা, আধুলি, সিকি স্বর্ণনির্ম্মিতও আছে। স্বর্ণনির্ম্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

৪ পয়সায়	১ আনা ;
৮ পয়সায়	১ দুয়ানি ;
৪ আনায়	১ সিকি ;
৮ আনায়	১ আধুলি ;
১৬ আনায়	১ টাকা।

সিকি, পয়সা অপেক্ষা, অনেক ছোট ; কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা, ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য, রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য, স্বর্ণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে এক মোহরের মূল্য ১৬৲ টাকা, অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল ; কিন্তু এক্ষণে, উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দুষ্প্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে, মুদ্রার এত গৌরব

হইত না। দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

পাথরিয়া কয়লা—কেরোসিন তৈল

উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। পাথরিয়া কয়লা, ধাতুর ন্যায়, আকরে জন্মে। কোনও কোনও পাথরিয়া কয়লার আকর, ভূমির অনেক নিম্নে থাকে। লোকে, গভীর কূপ খনন করিয়া, ঐ সকল খনিতে উপস্থিত হয়; এবং, শাবল প্রভৃতি দ্বারা কয়লা কাটিয়া, ভূমির উপরিভাগে লইয়া আইসে। রাণীগঞ্জ, আসন্‌সোল, সীতারামপুর, গিরিধি প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। আমরা যে পাথরিয়া কয়লা ব্যবহার করি, তাহা ঐ সকল প্রদেশে পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশেও কয়লার খনি আছে।

পাথরিয়া কয়লাকে রন্ধনকার্য্যের উপযোগী করিতে হইলে, এক বার, কি দুই বার, পোড়াইয়া লইতে হয়; তখন উহাকে কোক কয়লা বলে।

এক প্রকার পাথরিয়া কয়লা আছে, তাহা চুয়াইলে কেরোসিন তৈল নির্গত হয়। পূর্ব্বে এই

রূপেই কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হইত। কিন্তু, এক্ষণে আমরা যে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, তাহা আমেরিকা, রুশিয়া, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে আকরে জন্মে। আকরস্থলে, কূপখনন করিলে, এই তৈল, জলের সহিত নির্গত হইয়া, উপরে ভাসিতে থাকে। তখন লোকে উহা তুলিয়া লয়; এবং শোধন করিয়া, বিক্রয়ের জন্য, নানা দেশে পাঠাইয়া দেয়। কেরোসিন তৈল সহজেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব উহা সাবধান হইয়া ব্যবহার করা উচিত।

হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকন্দা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে, রুশিয়ার অন্তর্বর্ত্তী য়ুরাল পর্ব্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে, হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময়, হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্য্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা, সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই, উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত, জলের ন্যায় নির্ম্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয়; কিন্তু, বিশুদ্ধ নির্ম্মল হীরাই, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ, ও নির্ম্মলতা অনুসারে, মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্টুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে; তাহার মূল্য ৫,৬৪,৪৮,০০০ পাঁচ কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩,৫০,০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে, এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে।

শোভা ও মূল্য বিষয়ে,উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। পদ্মরাগ সম্পূর্ণ রূপে নির্দোষ ও সৌষ্ঠবযুক্ত হইলে, হীরকের অপেক্ষাও মূল্যবান্ হয়; তবে এরূপ পদ্মরাগ অতি বিরল। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে,হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের এক খণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করা, কেবল অহঙ্কারপ্রদর্শন ও মূঢ়তা মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুইই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেয় নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে, কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি, বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্ম্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, অর্থাৎ উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাসি বন্ধ করিলে, পূর্ব্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সাসি কাচে নির্ম্মিত। সূর্য্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকা ও এক প্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কৃত থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কৃত হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সাসি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে; তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়াদেশীয় কতকগুলি বণিক্ জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলি নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া, অগ্নির উত্তাপে গলিয়া, কাচ হইয়াছিল।

উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যে রূপে, যে দেশে, কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায়, এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও এমন বিস্বাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল, সকল স্থানে, সমান লোণা নহে; কোনও স্থানে অল্প

লোণা, কোনও স্থানে অধিক। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা, দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোণা হয়। আমরা সচরাচর যে লবণ খাই, তাহা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে, সমুদ্রের জলে জ্বাল দিয়া, এখনও লবণ প্রস্তুত করে। লোণা জল সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া গেলে, লবণের ভাগ পড়িয়া থাকে। রাজপুতানা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সকল লবণের খনি আছে, তাহা এই রূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

সমুদ্র, সকল স্থানে, সমান গভীর নহে; কোনও কোনও স্থলে, উহা যে কত গভীর, এ পর্য্যন্ত, তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবে না। অনেকে

সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩,১২০ হাত, কেহ ৪,৮০০ হাত, কেহ ১৮,৪০০ হাত, দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও রজ্জুই তলস্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং, সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

লাপ্লাস্ নামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আর, যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে, সমুদয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন দুই বার করিয়া সমুদ্রের জলে যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জুয়ার বলে; আর, ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ

ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে, বড় বিপদ্; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস্ নামে একটি যন্ত্র থাকে, ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্ব্বদা উত্তর মুখে থাকে; তাহা দেখিয়া, নাবিকেরা দিঙ্নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব্ব দিক্ বলে; যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক্ বলে। পূর্ব্ব দিকে ডানি হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, ও পশ্চাতে দক্ষিণ দিক্ হয়। এই পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া, লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদী ও অন্য অন্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। প্রায় সমুদয় নদীর উৎপত্তিস্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু

প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়; এজন্য ঐ সময়ে, সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্ব্বদা, কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া, আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা, পুনরায়, নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে মৎস্য, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি নানাপ্রকার জলজন্তু আছে।

পরিশ্রম—অধিকার

আমরা, চারি দিকে, যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি, পরিশ্রম করিয়া, উহা

প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে, কেহ কোনও বস্তু পাইতে পারে না। ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে, গৃহনির্ম্মাণ ও কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না; খাদ্য সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ও পাঠ্য পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না; সকল লোক দুঃখে কাল-যাপন করিত; পৃথিবী, এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত, যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে, কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া, ধনবান্ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি, পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে, এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং, সেই কয় জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি, অতঃপর, আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে, তাহা ফুরাইয়া যাইবে; সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে, ছিন্ন হইবে। এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে; তাহা হইলে, সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা, পরিশ্রম করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যত দিন কর্ম্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা, বৃদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; না করিলে, ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি, পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে; তাহা হইলে, বড় হইয়া, অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন

বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা, অলস হইয়া, সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা, বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না; সুতরাং, যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি, পরিশ্রম করিয়া, যে বস্তু উপার্জ্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন, অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না; এজন্যই, তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত,আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে, তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু, তাহার নিকট চাহিয়া, অথবা কিনিয়া লওয়া

উচিত; অজ্ঞাতসারে, অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোনও দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত; আপনার হইল, মনে করিয়া, লুকাইয়া রাখিলে, চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয়; তাহার কত অপমান; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয়; চোর বলিয়া, কেহ বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও, পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে; তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার; সকলেই, বিনা পরিশ্রমে, পাইতে পারে। বায়ু, সূর্য্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, ও এরূপ আর আর বস্তুতে, সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা পরিশ্রমে, তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

শিল্প—বাণিজ্য—সমাজ

লোকে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করে, তাহাদিগের অধিকাংশই, নানা উপায়ে, ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কার্পাস কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তূল হইতে সূত্র, এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে, বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হইয়া থাকে। লৌহ আকরে জন্মে; কিন্তু লৌহ হইতে ইস্পাত এবং সেই ইস্পাত হইতে ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, পুনর্ব্বার পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হয়। এই সকল কার্য্যকে, সচরাচর, শিল্পকার্য্য বলে।

কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা যায়। উহারা না থাকিলে, আমাদিগের এক দিনের জন্যও, সুখে বাস করা সুকঠিন হইত। তন্তুবায় না থাকিলে, বস্ত্রাদি মিলিত না; কুম্ভকার না থাকিলে, রন্ধনকার্য্য চলিত না, কর্ম্মকার না থাকিলে, কি কুম্ভকার, কি তন্তুবায়, কেহই যন্ত্রাদির অভাবে, স্ব স্ব শিল্পকার্য্য চালাইতে পারিত না। এজন্য, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই, শিল্পীদিগের যথেষ্ট

আদর। যে দেশে শিল্পকর্ম্মের যত উন্নতি, সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে, এত ধন ও ঐশ্বর্য্য, শিল্পকর্ম্মের উন্নতি তাহার একটি প্রধান কারণ।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্ম্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন্ বা মলমল নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, য়ুরোপে, সুবর্ণের দরে বিক্রীত হইত। কটক প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, সকল স্থানেই, আদৃত হইত। জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে, এই সকল শিল্পের লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কৃষকেরা যে শস্যাদি উৎপাদন করে, এবং শিল্পীরা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা সকলের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। এজন্য, কোনও কোনও লোক, কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতে, এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে; এবং ঐ সকল লোককে বণিক্ বা ব্যবসায়ী বলিয়া থাকে। কৃষক ও শিল্পী না

থাকিলে, যেরূপ, দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না, ব্যবসায়ী না থাকিলে, সেইরূপ, সকলে সুবিধামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না।

সকল দেশে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মে না, বা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয় না। কোনও কোনও দেশ ধান্যের বিশেষ উপযোগী; তথায় অল্প পরিশ্রমেই অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও দেশের ভূমিতে তত ধান্য জন্মে না; কিন্তু কার্পাস চাস করিলে, যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। কোনও কোনও দেশে লবণের খনি আছে; কিন্তু অপর কোনও দ্রব্য ভাল জন্মে না। এই সকল দেশের লোক আপন আপন দ্রব্যাদি বিনিময় করিলে, সকলেই নিজ নিজ আবশ্যক সামগ্রী লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের গুণে, লোকের সুখ ও সচ্ছন্দতার যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা; এখানে খাদ্য সামগ্রী, অধিবাসীদিগের যে পরিমাণে আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক জন্মিয়া থাকে। আমরা, এই

খাদ্য সামগ্রীর কিয়দংশের বিনিময়ে, কোনও কোনও আবশ্যক বস্তু অপরাপর দেশ হইতে প্রাপ্ত হই। আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আইসে। লবণ, বস্ত্র, নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র ইত্যাদি বিলাত হইতে, এবং কুইনাইন, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকা হইতে, আনীত হয়।

কৃষক, শিল্পী, ও বণিক্ এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই আমাদের সমুদয় অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপার্জ্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে, অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এই রূপে, নানা শ্রেণীর লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংঘটিত হয়।

সমাজ না থাকিলে, মনুষ্য কোনও বিষয়ের, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের, এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। পশুপক্ষীদিগের সমাজ নাই, সুতরাং তাহাদের কোনও উন্নতিও নাই। কেবল আহার অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া

যায়। কিন্তু সমাজ থাকাতে, মনুষ্যেরা,আহারাদির সংগ্রহ ব্যতীত,জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপার্জ্জন করিবারও যথেষ্ট সময় পায়।

সমাজে ভাল মন্দ নানাবিধ লোক বাস করে। এক দিকে, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকেরা, সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দ্বারা,সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, এবং দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া, সমাজের সুখবর্দ্ধন করে। অপর দিকে, চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি-গণ,পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল লোকের দমন করিতে না পারিলে, অল্পকাল মধ্যেই, সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যিনি, সকলের উপর কর্ত্তা হইয়া, দেশে শান্তিরক্ষা করেন,তাঁহার নাম রাজা। রাজা, রাজপুরুষগণের সাহায্যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন; এবং, পিতার ন্যায়,সর্ব্বদাই আমাদের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা করেন। অতএব সকলেরই, রাজাকে ভক্তি ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলকান্ত—নীল বর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিত বর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, ঝরনা, পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিত বর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে, কোনও মতে উচ্চ নীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু থাকে। ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত দ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়োলেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ—প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিত করণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট্ আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্ত্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌর মাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্র মাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৫৪ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পলে, আর সৌর মাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩২ পলে হয়। ইলাহী প্রবর্ত্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের অনুযায়িনী গণনা অনুসারে, ৩৫৫ বৎসর, আর সৌর মাসের অনুযায়িনী গণনা অনুসারে, ৩৪৫ বৎসর, হইয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে হিজিরার অব্দ ১৩১৮; ইলাহীর অব্দ ১৩০৮। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এই জন্য, কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইঙ্গরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।